প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

।।১।।

এই যে বিষয়টা ''প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম'' এটা আমি কেন বাছলাম এটা খানিকটা যিনি প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থিত করলেন তিনি আপনাদের কাছে অনেকটাই বলে দিয়েছেন। আমি গোড়ায় দু-একটা কথা আগে বলে নিতে চাই। এটা ভূমিকা বলুন বা যাই বলুন। প্রথম কথা হচ্ছে ধর্ম কথাটা আমরা যখন ব্যবহার করি, বা ধর্মের বা ধর্ম শব্দটার সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই, তখন স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু ধর্মের মধ্যে কোনও গোলমাল আছে এরকমটা আমাদের মনে হয় না। ধরুন আমরা যখন কাউকে বলি ধার্মিক বা ধর্মভীরু, তখন কী মনে হয়? মনে হয় দুটো কথা। একটা হচ্ছে এটা একান্তই একটা ব্যক্তিগত পরিসরের ব্যাপার। আপনি ধর্ম বিশ্বাসী, আমি ধর্ম বিশ্বাসী হয়তো নই। এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ঃ আপনি বাড়ীতে বসে পুজো-আর্চা করুন, আপনি বাড়ীতে বসে নামাজ পড়ুন - এটা আপনার একান্তই ব্যক্তিগত পরিসরের ব্যাপার। এর মধ্যে কোনও সমস্যা বা গোলমালের কারণ নেই। দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে যে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, — চতুর্দিকে গোটা পৃথিবীব্যাপী ধর্মের নামে একটা ভয়ঙ্কর রকমের হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে — ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। ধর্ম নিয়ে এরকম হিংসা, ধর্ম নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এসব মানবসভ্যতার ইতিহাসে বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে। সুতরাং এটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। আপনারা বলতে পারেন যে, বিংশ শতাব্দীর দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল তার পরের যে আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর, সেখানে এরকম ধর্মের নামে হানাহানি আমরা দেখিনি। এটা একবিংশ শতাব্দী যত এগোচ্ছে তত যেন তার এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে। সেজন্যই আমাদের কাছে এটা নতুন বলে মনে হচ্ছে।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মের নামে এত যে অধর্ম হচ্ছে, এর ব্যাখ্যাটা কি? এর ব্যাখ্যাতে আমি একটু পরে আসছি। একজনের একটা উক্তি আপনাদের সামনে আমি রাখছি আর আরেকটা উক্তি বহুকালের পুরোনো একটা বাংলা ছবি 'দাদাঠাকুর'-এর। 'দাদাঠাকুর' ছবিতে দাদাঠাকুরের অনেক সুন্দর সুন্দর ছড়া আছে, যার একটি পংক্তি এরকম ঃ কলকাতার ধর্মতলাতেই যতরকম অধর্ম হয়। কথাটা অতীব সত্য। আর এই দিন দুয়েক আগে আপনারা দেখেছেন যে অত্যন্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বামী অগ্নিবেশ প্রয়াত হয়েছেন। ওঁর একটা সাক্ষাৎকার একটি ইংরাজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে গতকাল। সেই সাক্ষাৎকারের মধ্যে তিনি একটা কথা বলেছেন। তিনি ধর্মবিরোধী একেবারেই ছিলেন না এবং ধর্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি বলেছেন যে ধর্ম গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা মহামারির আকার ধারণ করেছে। এবং এই মুহূর্তে প্রয়োজন ধর্মকে বিনাশ করা। এই কথাটা স্বামী অগ্নিবেশ বলছেন। তাহলে গোলমালটা কোথায়? এই গোলমালটা কোথায় বোঝার জন্যেই আমি আমার মতো করে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বোঝার চেষ্টা করেছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে খানিকটা আমি ভাগ করে নিতে চাই আমার ভাবনার মাধ্যমে।

।।২।।

আমি কিন্তু ধর্ম নিয়ে কোনও একটা তাত্ত্বিক গুরুগম্ভীর আলোচনার ভেতর একেবারেই ঢুকব না। এটা তো ঠিকই যে সাধারণভাবে আমাদের জীবনে, আমাদের নিজেদের দেশের কথাই যদি ভাবি, ধর্মকে বাদ দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা প্রায় অসম্ভব। আমরা যে খুব সচেতনভাবে ধর্মানুরাগী তা নয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন

আমাদের জীবনকে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা হয়তো সেটা সম্পর্কে খুব সচেতন থাকি না। যেমন ধরুন যে কোনও শুভ কাজ যদি করতে হয় — সেটা একটা অন্নপ্রাশন হতে পারে, একটা বিবাহ হতে পারে, পূজা পার্বণ তো ছেড়েই দিলাম, তো এই সমস্ত করতে গেলে আমাদের কিন্তু সবসময়ই মনে হয় যে একটা ভালো দিন দেখি, একটা শুভ দিন দেখি। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তখনই পঞ্জিকার খোঁজ পড়ে। তারপরে কে আসবেন, পৌরোহিত্য করবেন, এই সব নানান রকম ধর্মীয় ব্যাপার চলে আসে। সুতরাং ধর্ম ব্যাপারটা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে, এই যে জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা, এর ব্যাখ্যাটা কী? এটা কিন্তু আমরা সবসময় ভালো করে ভেবে দেখি না। আমি এখানে আপনাদের কাছে বলবো তিনভাবে এই ধর্মের উপস্থিতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আছে। প্রথম যে কারণটা বলবো, সেটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এইরকম ঃ মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হয়ে থাকুক, চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে যতই নতুন নতুন ওষুধ বেরিয়ে থাকুক, শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন নতুন যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যতই যাই হোক, এসব সত্ত্বেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একটা ভয়ানক রকমের অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে। যত আমাদের আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতার কারণে হোক, বয়সজনিত কারণে, নানা কারণে মানুষের মধ্যে কিন্তু সারাক্ষণ একটা বিপন্নতার বোধ কাজ করছে। কিন্তু এই বিপন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তিটা কোথায়? সত্যি কিন্তু আমরা তার উত্তরটা জানি না। আপনার বাড়িতে একজন কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার কিছু করার নেই। তখন আপনি কী করেন? তখন মানুষ ঐ অন্য কিছুর আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেই কিন্তু ধর্মের ব্যাপারটা আসে। তখন হয়তো মনে হয় যে আমি ধর্মীয় কিছুর যদি আশ্রয় নিই। সেটা ধর্মীয় অনুশাসন হতে পারে কিংবা ঈশ্বরভক্তি, অর্থাৎ, যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি, যাকে আমি স্পর্শ করিনি, মানুষ কল্পনা করে নেয় যে এটাই হচ্ছে তার আশ্রয়। অর্থাৎ, এর মধ্যে একটা কল্পনার ব্যাপার আছে, একটা imagination-এর ব্যাপার আছে। অর্থাৎ, যেটা আমি চাইছিলাম, মানুষটি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক বা তিনি যাতে মারা না যান এমনটা কল্পনা করা। ধরুন একটা বিপর্যয় হয়ে গেছে। মনে হয় যে এই বিপর্যয় কি অবধারিত ছিল! এটা কি ঠেকানো যেত না? তখনি কিন্তু মানুষ ভাবতে শুরু করে, কেন এটা হল। এর জন্য কে দায়ী। সত্যি আমি জানি না। এটা হয়তো pure and simple একটা accident, এটা হয়তো ঘটে গেছে। হয়তো আমারই ভুলের জন্য কোনো একটা কিছু ঘটে গেছে। অর্থাৎ, যেগুলোর পেছনে আপনি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না, কোনও যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে যার কোনও ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, কিন্তু আপনি মনে করছেন এই অনিশ্চয়তা থেকে এই নিরাপত্তাহীনতা থেকে আপনার একটা মুক্তি দরকার। অর্থাৎ, আপনি একটা কিছু চাইছেন। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটছে না। অথচ আপনি চান এটা হোক। এই যে দুয়ের দ্বন্দ্ব, এই যে contradiction, এর নিরসন করতে হয়, তখনই কিন্তু আপনি একটা আশ্রয় খোঁজেন। এবং সেই আশ্রয়টা হল কল্পনা, একটা imagination. আপনাকে ভাবতে হয় যে এই আশ্রয়টা নিলে হয়ত এর একটা কিছু সুরাহা হবে। এটা হচ্ছে প্রথম ব্যাখ্যা যে মানুষ কেন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে প্রাত্যহিক জীবনে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা সাধারণভাবে একটা ভালো কিছু করার কথা ভাবি অর্থাৎ, কতগুলো সুগুণ সম্পন্ন মূল্যবোধ, কতগুলো values, এই মূল্যবোধগুলো আমরা মনে করি আমাদের জীবনে প্রয়োজন, আমাদের জীবনকে গড়ে দেয়। 'ভালো', 'সু', 'শুভ' - এসবের মধ্যে একটা ঔচিত্যের প্রশ্ন আছে। জীবনে আমাদের অনেক খারাপ খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, খারাপ খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আমাকে কেউ ঠকিয়ে দিল, বা আমি অন্য কোনওভাবে বঞ্চিত হলাম। একটা কোনও অন্যায় আমাকে হয়তো মেনে নিতে হচ্ছে।

তখনই কিন্তু মনে হয় যে এগুলো হওয়া তো ঠিক নয়। তাহলে এই যে ঠিক নয়, অর্থাৎ যেগুলো 'কু' তার বিপরীতে 'সু', যেটা 'অশুভ' তার বিপরীতে 'শুভ' এই যে ভাবনাগুলো এগুলো কিন্তু আসলে কতগুলো নৈতিকতার ভাবনা। এই নৈতিকতার ভাবনার সঙ্গে কিন্তু ধর্ম ব্যাপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, অর্থাৎ, কতগুলো মূল্যবোধ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি 'কু' ব্যাপারটা না থাকতো, তাহলে পৃথিবী অন্যরকম হয়ে যেত। এখানেও বাস্তবে খারাপ বিষয়গুলোর উপস্থিতি এত বেশি যে এক এক সময় জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে আমরা যা দেখি, বিশেষ করে বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কল্যাণে আমরা টিভি-র পর্দায় যা দেখি, খবরের কাগজ খুললে যা দেখি তার বেশিটাই তো হচ্ছে খারাপ। আমরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করি আমরা কি এগুলো অনুমোদন করি? এগুলোকে কি সত্যি আমরা মান্যতা দিই? আমরা তো দিই না। আমরা নিজেদের মধ্যে যদি আলোচনা করি এগুলো অসহ্য মনে হয়। তাহলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে, আমরা অত্যন্ত খারাপ এক পৃথিবীতে রয়েছি। চতুর্দিকে কতগুলো খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটছে। অজস্র। প্রতিদিন। প্রায় একটা স্রোতের মতো চলছে। কুকথা, কুরুচির আধিক্য এত বেশি যে সবসময়েই মনে হয় তার উল্টোটা তো আমরা জানি, উল্টোগুলো কী হওয়া উচিত। কিন্তু তা ঘটছে না। তাহলে সেটা আমরা কোথা থেকে পাব? বর্তমান যা পরিবেশ, পরিস্থিতি, তার মধ্যে যাঁরা এগুলো করে বেড়াচ্ছেন তাদের কাছ থেকে এর উত্তর পাবো না। তাহলে কিন্তু একটা বিকল্পের শরণাপন্ন হয়ে এগুলোর উল্টোটা খুঁজে বার করতে হয়। তার সূত্রটা রয়ে গেছে অন্যত্র। তখনই মনে হয় যে ধর্মগ্রন্থ, ধর্মের অনুশীলন এই ব্যাপারগুলো প্রয়োজন। অর্থাৎ, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। আমরা নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে তখন ধর্মকে আঁকড়ে ধরি।

তাহলে প্রথমটা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা, অনির্দিষ্টতা, বিপন্নতাবোধ। আরেকটা হচ্ছে, নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে আমরা ধর্মের আশ্রয় নিই, কারণ, নৈতিকতাকে আমরা জীবন থেকে বাদ দিতে পারি না। নৈতিকতা যদি আমাদের জীবনে না থাকে, কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক — এই তফাতটাই যদি আমাদের জীবন থেকে চলে যায়, তাহলে আমরা আর মানুষ থাকি না। তাহলে মানুষের সঙ্গে পশুর আর কোনও তফাৎ থাকে না। এই নৈতিকতার উপস্থিতিটা আমাদের জীবনে প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন মানুষ হিসেবে। তার জন্য আমরা তখন ধর্মের আশ্রয় নিই।

তৃতীয় যে ব্যাখ্যাটা সেটা নিয়ে আমরা প্রায় ভাবিই না। সেটা কিন্তু আরও অনেক সূক্ষ্ম। আরও অনেক গভীর। সেটা হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে নান্দনিক অনুভূতির সম্পর্কের বিষয়টি। এটা যে সবসময় সবার জীবনে প্রবলভাবে উপস্থিত তা নয়। কিন্তু এটা যে কোনও একজন স্পর্শকাতর মানুষ, যে কোনো একজন সুরুচিসম্পন্ন মানুষ, তার কাছে এটা খুব অর্থবহ। আমি এখানে একটাই উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে সঙ্গীত, বিশেষ করে আমাদের দেশে। আমাদের দেশে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যারা বড়ো বড়ো সঙ্গীতকার তাদের জীবন যদি আমরা দেখি সেখানে দেখব তাকে আমরা জানি সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে, কিন্তু তিনি যে সঙ্গীতের মধ্যে লিপ্ত আছেন, সেই সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত একটা ধর্ম ভাবনা — সেই ধর্ম ভাবনা মানে সেটা কিন্তু কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মভাবনা নয়, তিনি হয়ত মন্দিরে যান, মসজিদে যান, সেটা কিন্তু এখানে বড়ো কথা নয়। তিনি সেই সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন করছেন। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এই পর্বের আলোচনাটা শেষ করব। আপনারা আগ্রহী থাকলে দেখতে পারেন youtube-এ। ভারতীয় হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকার উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ। তাঁর একটা recording আছে। হয় পঞ্চাশের দশকের শেষ বা ষাটের দশকে — আমার ঠিক মনে নেই। সেই recordingটা কলকাতায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে ডিকসন লেন-এ

হয়েছিল। ছায়ানট রাগে তিনি খেয়াল গাইবেন। তিনি শুরুতে বলছেন — "বহুত ডর লাগতা হ্যায়।" কেন তাঁর 'ডর' লাগছে? কেন তাঁর ভয় লাগছে? তিনি বলছেন যে আমি এই যে ছায়ানট গাইব আপনাদের সামনে — "ম্যায় তো পূজারী হুঁ"। আমি তো রাগের পূজারী। তো আমি এই পুজোটা ঠিক মতো করতে পারব তো? — এটাকে আপনি কী দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন? একটা আশ্চর্য নান্দনিক অনুভূতি। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, নামাজ পড়তেন, সবই করতেন। এখানে তিনি নিজেকে যুক্ত করছেন আল্লার সঙ্গে — অর্থাৎ এই রাগটা তিনি পরিবেশন করতে যাচ্ছেন যেন আল্লার উদ্দেশ্যে তিনি পুজো দিচ্ছেন। পুজো দিতে গিয়ে তাঁর মনে হচ্ছে যে পুজোটা না নষ্ট হয়ে যায়। ওঁর মতো শিল্পী এ কথা বলছেন। নান্দনিক অনুভূতিটা কোন পর্যায়ে গেলে ওঁর মতো শিল্পী এই কথাটা বলতে পারেন! কি আশ্চর্য humility এবং কি গভীর নান্দনিক বোধ থেকে এই কথাটা তিনি বলছেন। কিন্তু এই ধর্মবোধের সঙ্গে আমাদের যে ধর্মবোধ, সাধারণভাবে আমরা ধর্ম বলতে যা বুঝি তার কিন্তু কোনও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কিনা ধর্ম এখানে একটা নান্দনিক অনুভূতি। এটা essentially একটা subjectivist, একটা inner most feeling, একটা aesthetic understanding. এইভাবেও কিন্তু ধর্মকে দেখা যেতে পারে।

প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের উপস্থিতিটা কতটা প্রবল এবং কী বিচিত্রভাবে এটা উপস্থিত হয় আমাদের জীবনে আমরা হয়তো সেই বিষয়ে সচেতন নই। কিন্তু ধর্ম আমাদেরকে এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে বহুমাত্রিক স্তরে।

।।৩।।

আমি এর পরের যে অংশতে আসছি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা। আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতে যিনি প্রথম ভূমিকাটা করলেন তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন ধর্ম আমাদের ব্যক্তিগত পরিসরের বিষয়। কিন্তু সত্যিই যদি ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত পরিসরের বিষয় হয় তাহলে তো এই প্রশ্নটা ওঠে যে তার নিয়ন্ত্রণটা কার? আমার। এটা আমার ব্যক্তিগত পরিসরের ব্যাপার। আমিই তো তার নিয়ন্ত্রণকর্তা। আমি আমার ধর্মাচরণ কীভাবে করবো না করবো সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে তো অন্য কারোর কোন কথা বলার জায়গা নেই। আর অন্যের কথাকে আমার গুরুত্ব দেবারও কোন প্রয়োজন নেই। এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রশ্ন হল আমার ব্যক্তিগত পরিসরে ধর্মের যে উপস্থিতির কথা আমরা বলি তার ওপর কি সত্যিই আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে না নেই। আমরা কি সত্যিই তার নিয়ন্ত্রণকর্তা? আমরা কি নিয়ন্ত্রক? এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আমাদের ভেবে দেখার সময় হয়েছে। আমি এখানে কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে রাখবার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে যে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, নানারকম ভাবে। যেমন, একটা শুভ দিন দেখা, শুভ কাজ করতে গেলে খানিকটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি অনুসরণ করা, সেটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হতে পারে, সেটা বিবাহ অনুষ্ঠান হতে পারে, সে অনেক কিছুই হতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা কী করি খেয়াল করে দেখুন। আমরা কিন্তু অন্যের শরণাপন্ন হচ্ছি। কীভাবে? তিনটি বিষয়ের প্রবল উপস্থিতি আমাদের এই তথাকথিত প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে স্থান তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং আমরা সমস্ত সময় তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। আমরা তার শরণাপন্ন হচ্ছি। যতই আমরা বলি যে এটা আমার একটা private domain বা আমার ব্যক্তিগত পরিসরের ব্যাপার আদৌ তা নয়। এই তিনটি উপাদান কী কী? একটি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ। একটি হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এবং আরেকটি হচ্ছে ধর্মগুরু। এরাই ঠিক করে দিচ্ছে যে আমার ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের যে উপস্থিতি তার চেহারাটা কেমন হবে। সে আমি হিন্দু হই, আমি মুসলমান হই, আমি খ্রিস্টান হই, আমি জৈন হই, আমি শিখ হই। প্রত্যেকের কিন্তু কতগুলো ধর্মগ্রন্থ আছে। এই ধর্মগ্রন্থকে বাদ দিয়ে আমরা কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের

ধর্মের কথা ভাবতেই পারি না। এগুলো যে আমি necessarily পাঠ করেছি একেবারেই তা নয়। আমি কিছু কিছুর নাম শুনেছি। আমি নাম শুনেছি গীতা, আমি নাম শুনেছি বাইবেল, আমি নাম শুনেছি কোরান, আনি নাম শুনেছি গ্রন্থসাহেব। আমার এসব পড়ে দেখার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার সময়ও নেই, আমার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু এগুলো বাদ দিয়ে আমি আমার ধর্মের কথা ভাবতেও পারি না। এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ। আমার ধর্মের অনুষঙ্গ এগুলো। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধর্মগ্রন্থগুলোকে ব্যাখ্যা করা কীভাবে হচ্ছে। যারা ব্যাখ্যাকার, তাঁরা কীভাবে এসবের ব্যাখ্যা করছেন। এখন এ নিয়েও নানা মুনির নানা রকম মত আছে। কিন্তু আমার কাছে এ সবই অথেন্টিক, প্রামাণ্য। এখন কে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন না করেছেন আমি এসব বুঝি না। আমি সাধারণ মানুষ। হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, শ্রাদ্ধের সময় যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন তার ভেতরে সবকিছু আছে। তাতে বেদ আছে, উপনিষদ আছে, চন্ডী আছে, পুরাণ আছে। নানান রকম নানান কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু আপনার সামনে পেশ করা হয়। অর্থাৎ, এগুলোকে যেভাবে interpret করা হয়েছে, এগুলোকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই ব্যাখ্যাকার যাঁরা, এগুলোকে তাঁরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলোই কিন্তু আমার কাছে ধর্ম। এইভাবে কিন্তু আপনার নিজের মনের ভেতরে ধর্মের পরিসরটা তৈরি হচ্ছে। এটা হচ্ছে ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে।

এবারে প্রতিষ্ঠান। আপনি প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের যে অনুশীলন বা ধর্মের যে উপস্থিতি সেটাকে সুনিশ্চিত কী করে করবেন? আপনাকে হয় মন্দির, নয় মসজিদ, না হলে গির্জা, না হলে গুরুদ্বারের শরণাপন্ন হতে হবে। হ্যাঁ, দু-চারজন ব্যতিক্রম আছেন। আপনি বাড়িতে বসে উপাসনা করছেন। সে আলাদা কথা। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের কিন্তু প্রথমেই খোঁজ পড়ে যে একটু মন্দিরে গিয়ে মাথাটা ঠেকিয়ে আসি, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ি। এই যে ব্যাপারগুলো, অর্থাৎ কিনা ধর্মের ভাবনাটা যে বাস্তবায়িত হচ্ছে, অর্থাৎ ধর্ম এবং আমার মাঝখানে সংযোগ তৈরি করে দিচ্ছে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান। আর তার সঙ্গেই আসছেন ধর্মগুরু। ধর্মগুরু কথাটাকে আমি একটু অন্যভাবে বলছি, একটা broad sense-এ বলছি। প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করছেন কিন্তু কিছু ব্যক্তি, কিছু মানুষ। তিনি মৌলবি হতে পারেন, তিনি গীর্জার father হতে পারেন, তিনি মন্দিরের পুরোহিত হতে পারেন। এরকম। এঁরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালাচ্ছেন। সুতরাং আপনি জড়িয়ে যাচ্ছেন এঁদের সঙ্গে।

এই গোটা ব্যাপারটাকে এবার একটু গুছিয়ে তোলা যাক। তথাকথিত আমার যে ব্যক্তিগত পরিসর, এই ব্যক্তিগত পরিসরটা আদৌ আমার ব্যক্তিগত পরিসর নয়। এই ব্যক্তিগত পরিসর বা private domainকে কিন্তু পরোক্ষভাবে হোক, প্রত্যক্ষভাবে হোক নিয়ন্ত্রণ করছে বাইরের কতগুলো উপাদান বা Agency. এগুলোই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তার মানে private domain-টাকে public domain কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং এটা যে মুহূর্তে হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দুটো ব্যাপার ঘটছে। একটা হচ্ছে যে এই প্রাতিষ্ঠানিকতা যখন ধর্মীয় আদল নিতে শুরু করে তখনই কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় কতগুলো স্বার্থ। সেই স্বার্থ অনেকরকম হতে পারে। বাণিজ্যিক স্বার্থ হতে পারে, নানানরকম অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে, নানা ধরনের একেবারে ছোট ছোট সামাজিক স্বার্থ হতে পারে। তখনই কতগুলো হিসেব-নিকেশ, দেনা-পাওনার ব্যাপার চলে আসে। যখন কোনও পুরোহিতকে বাড়িতে ডাকছেন তাঁকে একটা দক্ষিণা দিতে হবে। সেই দক্ষিণাটা কীভাবে ঠিক করা হবে? হিন্দুধর্মে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অন্যতম অনুষঙ্গ হল ব্রাহ্মণকে দান করা। যাদের একেবারে সঙ্গতি নেই, তারা করেন 'ছয় দান'।

ছটি বস্তু দান করলেই হয়ে গেল। যেটা আমরা সচরাচর দেখি, সেটা হচ্ছে 'ষোড়শ' বা ষোলোটা দান। তাতে খাট, পালঙ্ক, জুতো, ছাতা থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক কিছু দান করা হয়। তার ওপরে আছে 'বৃষোৎসর্গ'। 'বৃষোৎসর্গ' খুব বড়ো করে হয়। সেখানে গরুকেও অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে দান করা হয়। তারও ওপরে আছে, বিভিন্ন মহাকাব্যে আমরা যার উল্লেখ পাই, এখন হয় কিনা আমি জানি না - 'দানসাগর'। আরও বড়ো দান। সেখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার মুদ্রা দান করা হত। তাহলে এর সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। এটা কিন্তু পরোক্ষভাবে আমার প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে উপস্থিতি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু আমি সেটা বুঝতে পারছি না। আমি একেবারে আপ্লুত, আমি বিগলিত যে পুরোহিত মহাশয় এসে কী চমৎকারভাবে অনুষ্ঠানটা করে দিয়ে গেলেন। সবাই একেবারে ধন্য ধন্য করছে। এটা গেল একটা দিক।

আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা, ধর্ম যখন প্রাতিষ্ঠানিক চেহারাটা নেয় তার সঙ্গে তখন জড়িয়ে যায় ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রক্ষমতা। তখন কিন্তু আমার প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে ভাবনাটা সেখানে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। তখন আমার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আস্তে আস্তে হয়তো আজ থেকে এক বছর আগেও যে ভাবনাটা ছিল না, তার অনুপ্রবেশ ঘটে। সেটা হচ্ছে কতগুলো পাঁচিল তুলে দেওয়া। অর্থাৎ, আমার এই ধর্মটা কী অর্থে অনন্য - কী অর্থে অত্যন্ত বিশেষ - এবং তার চেয়েও বড় কথা এটা কী অর্থে অন্য ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। এই শ্রেষ্ঠতার প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে? ক্ষমতার সঙ্গে যখন ধর্মের বিষয়টা জড়িয়ে যায় তখন মনে হয় যে এই ধর্মীয় ভাবনা বা ধর্মভাবনা এটা আমাকে ক্ষমতাশালী করছে। এর ফলে আমার একটা ক্ষমতায়ন ঘটছে। অর্থাৎ, আমি যদি এই ভাবনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু আমার নিজস্ব একটা ক্ষমতায়ন ঘটছে যারা এই ভাবনার দ্বারা তাড়িত, ভাবিত, নিয়ন্ত্রিত, তার সঙ্গে যদি আমি নিজে যুক্ত হয়ে যাই, তাহলে আমিও কিন্তু এই ক্ষমতার একজন অংশবিশেষ হয়ে উঠি। এর পিছনে রাজনৈতিক দল থাকতে পারে, রাজনৈতিক গোষ্ঠী থাকতে পারে। যাই থাকুক না কেন, আমি যদি তার সঙ্গে এবার নিজে যুক্ত হয়ে যাই তাহলে আমার প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম একটা রাজনৈতিক মাত্রা পরিগ্রহ করে এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসি যে আমার আর সহনশীল হওয়ার দরকার নেই। আমার সহিষ্ণু হওয়ারও কোনও দরকার নেই। কারণ আমি প্রত্যয়ী যে আমার ধর্মবিশ্বাসই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেটা অন্যের থেকে আলাদা।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখান থেকে সরে যাচ্ছি একেবারে অন্য জায়গায়। প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল যে বিপন্নতা থেকে, নৈতিক চিন্তা থেকে, নান্দনিক অনুভূতি থেকে ধর্মের যে উৎসারণ, সেখানে কিন্তু ধর্ম আমাকে অনেক বেশি অন্বিত করে, সংহত করে। কিন্তু ধর্মের এই প্রাতিষ্ঠানিক চেহারাটা যেভাবে তৈরি হয় তার সুবাদে প্রশ্রয় পায় খণ্ডীকরণের ভাবনা। এখানে ধর্ম আমাকে খন্ডন করে দিচ্ছে, ভেঙে দিচ্ছে। তুমি আলাদা, ভিন্ন, স্বতন্ত্র। তোমার ধর্ম যদি X হয় আমার ধর্ম হচ্ছে Y এবং X-এর সঙ্গে Y-এর শুধু যে তফাৎ আছে তাই নয়। বারবার করে বলা হচ্ছে যে আমিই শ্রেষ্ঠতর। তখন Y কে মনে হবে যে সে আমার শত্রু। অর্থাৎ তখন Y এর বিরোধিতা করাটা আমার পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

।।৪।।

এবারে আমি আমার আলোচনার শেষ পর্বে চলে আসছি। এ থেকে মুক্তির উপায়টা কী? কীভাবে আমরা এখান থেকে বেরোবো? এটা একটা খুব কঠিন এবং জটিল প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নের উত্তরটা হয়তো অমীমাংসিতই থেকে যাবে। তবুও সাধারণভাবে দু-একটা কথা আমি বলার চেষ্টা করব এবং এটা বলেই আমি থামবো। একটা

কথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে এইসব ধর্মীয় ভেদাভেদ, ধর্মবিশ্বাস এসব থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার এবং তাকে নানাভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বিজ্ঞানমনস্কতার ভাবনার প্রসার এবং প্রচার, যুক্তিবোধের উপস্থিতিকে আমাদের জীবনে সুনিশ্চিত করা। এ তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু সমস্যা হল, এই কাজটা আপনি কীভাবে করবেন? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ধরলাম আপনার প্রাত্যহিক জীবনে আপনি এই যুক্তিবোধের দ্বারা তাড়িত, আপনি পরিচালিত। বিজ্ঞানমনস্কতার ভাবনায় আপনি সিদ্ধ। কিন্তু তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত শেষ বিচারে যে প্রশ্নগুলো দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তর কি আপনি পাচ্ছেন? এটি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

প্রথম বিষয়টি হল যে, ধর্মীয় গোঁড়ামির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যা প্রাধান্য পায়, সেটি হল ধর্মগ্রন্থের text-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি। text-এ যা আছে এবং পরবর্তীকালে সেটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে - এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট পার্থক্য থেকে যায়। আমাদের মুশকিল হচ্ছে যে এই interpreted text-টাই আমাদের কাছে বড়ো হয়ে যায়, যেখান থেকে জন্মায় কতগুলো rituals, কতগুলো customs, কতগুলো practices. বেদ উপনিষদের যে স্তোত্রগুলো, বা সেখানকার যে মূল পাঠ সেগুলিকে কিন্তু পরবর্তীকালে পুরাণ ও উপ-পুরাণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেগুলোই পরবর্তীকালে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে উপস্থিতি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, গড় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কিন্তু ধর্মের উপস্থিতিটা হচ্ছে ধর্মের কিছু অনুশাসনকেন্দ্রিক। অর্থাৎ ওই rituals, customs, practices তার সঙ্গে কিন্তু মূল ধর্ম ভাবনার, ধর্মগ্রন্থগুলোর যে মূল দর্শন তার একটা বিরাট পার্থক্য আছে। সব ধর্মগ্রন্থেরই দর্শনভাবনা যে মূল্যবোধগুলির কথা বলে, তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই দর্শনভাবনার উপস্থিতি আমরা টের পাই না, কারণ অনুশীলনের মাধ্যমে এই ভাবনা এক বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। তাই প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবোধ, যার অনুশীলন প্রাত্যহিক জীবনে করার জন্য বড় রকমের চেষ্টা করা হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ঠিক পরে পরে এই চেষ্টা করা হয়েছিল। মানুষের মধ্যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, নানা রকমের ধর্মীয় কুসংস্কার, এগুলোর অবসানকল্পে এবং তার জন্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধকে মানুষের মধ্যে যাতে জারিত হয় তার জন্য প্রভূত চেষ্টা করা হয়েছিল। এসব কাজে যাঁরা নিয়োজিত হলেন তাঁরা সাধারণভাবে ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন না, ঈশ্বরবিশ্বাসীও নন। এককথায় এঁরা ছিলেন নাস্তিক, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবল উপস্থিতির বিরুদ্ধে। বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম, রেডিও, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, বই-পত্র, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজে লাগিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হল। কিন্তু এই কর্মযজ্ঞে যাঁরা নিয়োজিত হয়েছিলেন তাঁরা কি তাদের দায়িত্বটা ঠিক ঠিক মত পালন করতে পেরেছিলেন? বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা গেছে যে, যাঁদেরকে আমি বলছি নাস্তিক যারা মাঠে নেমে পড়লেন যারা আস্তিক তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে ভাঙ্গার জন্য তাঁরা কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই খানিকটা জোরজবরদস্তি করে, খানিকটা কালাপাহাড়ি মনোভাব নিয়েছিলেন। এবং তাদের অনেকেরই কিন্তু মাথায় ঢোকেনি যে এইভাবে আপনি মানুষের ভেতরকার যে ধর্মবিশ্বাস, তার যে মূলগুলো, সেটাকে উৎপাটিত করতে পারবেন না। একটা ছোট্ট ঘটনা আপনাদের কাছে বলছি। ঘটনাটা ঘটেছিল রুশ বিপ্লবের পরে পরে মধ্য এশিয়াতে। আপনারা জানেন যে মধ্য এশিয়াতে প্রাক-বিপ্লব পর্বে ইসলামের প্রবল প্রভাব ছিল। রক্ষণশীলতা বিদ্যমান ছিল প্রায় গোটা মধ্য এশিয়া জুড়ে। এই সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বলশেভিক পার্টির জঙ্গীকর্মীরা নেমে পড়লেন। ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করলেন। মধ্য এশিয়ার কোনও একটা প্রদেশ থেকে লেনিনের কাছে

একটা টেলিগ্রাম আসে যে, তিনি শুনে খুব খুশি হবেন যে এখানকার যে একটা বহুদিনের পুরনো মসজিদ ছিল, সেটাকে তাঁরা মৌলবীদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। সেটাকে তাঁরা ভেঙে দিয়েছেন। লেনিন তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম করে পাঠান যে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে গিয়ে যেন ক্ষমা চান এবং বলেন তাঁদের এটা ঘোর অন্যায় হয়েছে। কারণ, এইভাবে কোনো ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাসকে বা ধর্মীয় অনুশাসনকে মানুষের মন থেকে উৎপাটিত করা যায় না। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী সাংস্কৃতিক লড়াই। অর্থাৎ বিজ্ঞান, যুক্তি - এগুলোকে cultivate করা দরকার। এগুলোকে মানুষের জীবনে চেতনার স্তরে জারিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, যারা নাস্তিক, তাদের সামনে এটা কিন্তু একটা বড় রকমের প্রশ্ন অথবা বড় রকমের সমস্যা। এটা শুধুমাত্র বিজ্ঞান মঞ্চের লড়াই নয়। এটা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের ব্যাপার নয়। আপনি সেখানে হয়তো নানারকমের বৈজ্ঞানিক যুক্তি হাজির করতে পারেন। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলোকে যদি মানুষের মনে প্রবেশ করাতে হয় তাহলে শত শত বছর ধরে বা হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে যে সব সংস্কার বা গোঁড়ামি তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত করে বসলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানমনস্কতার ভাবনাকে যুক্ত করতে হবে একটা দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের সঙ্গে। মানুষের যে লোকসংস্কৃতি তাদের যে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে এই বিজ্ঞানমনস্কতার ভাবনাকে যদি জুড়ে দেওয়া যায়, যদি এটা মানুষের কাছে বোঝানো যায় যে ধর্মীয় অনুশাসনের ভাবনাগুলো মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক সত্তাকেই খর্ব করে তাহলেই সে বুঝবে যে মানবিক সত্তার যদি যথার্থ প্রস্ফুটন ঘটাতে হয় তাহলে কিন্তু এই ধর্মীয় অনুশাসনের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তোমাকে এর জন্য কেউ বলছে না যে কাল থেকে তুমি মন্দিরে যাবে না, মসজিদে যাবে না। তুমি নিশ্চই যেতে পার। কিন্তু তুমি সাবধান, তুমি একটু সচেতন হও যে, ধর্মের যে মূল কথা, ধর্মীয় দর্শনের যে মূল কথা, আর ধর্মের যে অনুশাসন এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে। অনুশাসনের শৃঙ্খলের মধ্যে তুমি যদি নিজেকে আবদ্ধ করে ফেল নিজের অজান্তে, তাহলে তোমার যে যথার্থ মানবিক মূল্যবোধ - সেটা কিন্তু খর্ব হবে। অর্থাৎ, তুমিই তোমার নিজেরই সংকোচন ঘটাচ্ছ। তোমার মানবিক সত্তার তুমি সংকোচন ঘটাচ্ছ। এতে তুমি নিজেকে অপমান করছ, ছোট করছ। তুমি যেটাকে মনে করছিলে তোমার নিজস্ব পরিসর সেটা তোমার নিজস্ব পরিসর নয়। তোমার পরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কতগুলো উপাদান, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাণিজ্যিক স্বার্থ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা।

দ্বিতীয় কথাটি হল, ধরলাম যে একটা বিকল্প সংস্কৃতির ভাবনা মানুষের মধ্যে সঞ্জীবিত হল, একটা বিকল্প সংস্কৃতির দ্বারা মানুষ উদ্বুদ্ধ হল এবং ধরলাম যে মানুষের এই ধর্মীয় অনুশাসনের যে খপ্পর, তার থেকে মানুষ অনেকটা মুক্তও হয়ে আসতে পারলো। কিন্তু তার পরেও একটি প্রশ্ন তো থেকেই যায়। আমি একেবারে গোড়ায় যে কথাটা বলেছিলাম। ধর্মভাবনা থেকে কি মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করতে পারবে? মুক্ত করতে পারবে? অর্থাৎ, যতদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা বা নিরাপত্তাহীনতা বা বিপন্নতাবোধ কাজ করবে, যার ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, যখন মানুষ দেখবে যে কোনো যুক্তি দিয়েই, কোনও বিজ্ঞান দিয়েই আমি আমার এই সমস্যার সমাধান করতে পারছি না, আমি বিপন্ন বোধ করছি, তখন কিন্তু মানুষ একটা আশ্রয় খুঁজবে। ঐ যে নৈতিকতার ভাবনা, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অনৈতিক কাজকর্ম চলবে, অর্থাৎ, "খারাপ", 'কু'-এর প্রভাবটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত এর বাড়-বাড়ন্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষ একটা বিকল্প 'সু' বা 'শুভ'র কথা ভাববে। এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে এই 'কু'এর ভাবনার কোনও বিকল্প যদি যে খুঁজে না পায় তখন কিন্তু মানুষ কল্পনা করবে 'সু'-এর ভাবনা এবং তার জন্য মানুষ আবারও সেই ধর্মের মাধ্যমে ঐরকমই

কাল্পনিক ঈশ্বরের ভাবনার আশ্রয় নেবে। এবং সবশেষে নান্দনিক অনুভূতির বিষয়টি। একজন খুব প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী চিন্তক একটা কথা বলেছিলেন। তিনি অবশ্যই পশ্চিমের এবং তিনি ভীষণভাবেই বামপন্থী, ভীষণভাবেই সমাজতন্ত্রের সমর্থক। তিনি বলেছিলেন যে, ইতালিতে একটা চার্চের ভিতরে তিনি যখন ঢুকলেন সেখানে চার্চে তখন organ বাজছে, মধ্যযুগীয় সংগীত, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের বন্দনা করা হচ্ছে। তার ফলে যে নান্দনিক আবহটা তৈরি হচ্ছে, তা একটা hypnotic effect তৈরী করছে। অর্থাৎ, ওই নান্দনিক অনুভূতির মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা যিনি organ বাজাচ্ছেন, তাঁর কাছে যেমন, এবং সেখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদেরও অনুভূতি, মানুষকে যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আমি তখন যেন পার্থিব পরিসর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, যেন এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছি। এই সঙ্গীতটা কিন্তু একেবারে ধর্মীয় সংগীত। এটাকে আপনি কী করে উপেক্ষা করবেন? আমি আপনাদের কাছে বড়ে গুলাম আলি খাঁ-র যে দৃষ্টান্তটা দিয়েছিলাম, ঠিক সেই একই ব্যাপার। অর্থাৎ, এটাকে জোর করে যদি কেউ ভাঙ্গবার চেষ্টা করেন বা এগুলোকে নিয়ে বিদ্রূপ করেন বা এগুলোকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন তবে সেটা কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে।

আমি শেষ করছি একটাই কথা বলে। এই কথাটার একটা অংশের সঙ্গে আপনারা সবাই খুব পরিচিত। আর একটা অংশের কথা আমরা প্রায় বলিই না, খেয়াল করি না। মার্কসের সেই বিখ্যাত কথা যে, "ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম।" এটা হচ্ছে মার্কসের আসল কথাটার একটা অতি সরলীকরণ। তার আগের কথাগুলো আমরা খেয়াল করি না। সেই কথাগুলো কী? কেন ধর্ম জনগণের আফিম? কারণ, ধর্ম হচ্ছে যারা নিপীড়িত, যারা পীড়িত, যাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাদের দীর্ঘশ্বাস। যতদিন পর্যন্ত অনিশ্চয়তা থাকবে, এই বিপন্নতাবোধ থাকবে, এই নিরাপত্তাহীনতা থাকবে, যতদিন পর্যন্ত এমন কোনো আদর্শ ব্যবস্থা তৈরি না হচ্ছে, যেখানে আপনি সম্পূর্ণ অর্থে নিরাপদ, ততদিন ধর্মের উপস্থিতিও থাকবে। নিরাপত্তা কথাটা বলছি কিন্তু শুধুমাত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক অর্থে নয়। এরপরও কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও যখন আমরা দেখি যে এমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে একজন আক্রান্ত, যখন আপনার মনে হবে মানুষটির মৃত্যুই হচ্ছে তার মুক্তির একমাত্র রাস্তা, তখন কিন্তু আপনার এই ভাবনার সঙ্গে, অর্থাৎ, আপনি যখন বুঝতে পারছেন যে আপনি অসহায়, যখন অপনার সহায় দরকার, তখন সেই সহায়তার জন্য দৈব বলুন বা ঈশ্বর বলুন, মানুষ এই ভাবনার আশ্রয় নেবে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে অবস্থা, আমাদের দেশের যা অবস্থা তাতে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের উপস্থিতিটাকে আমরা কোনভাবেই উপেক্ষা করতে পারব না। এর সঙ্গে আমি এও বলব, ধর্মকে আমাদের এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার সময় এসেছে। আমরা ধর্মের উপস্থিতিকে নতুনভাবে যদি বোঝার চেষ্টা করি, একে যদি নতুনভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করি — নতুনভাবে একটু সাজাবার চেষ্টা করি, তাহলে হয়ত আমরা একটা কোনও বিকল্প পথ খুঁজে পাব।

(১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০তে Activism আয়োজিত গণ আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের সম্পাদিত পাঠ।
প্রতিলিপি ঃ প্রিয়াঙ্কা মালাকার)